নাম: মো: আব্দুল নুর

জন্ম তারিখ: ১ এপ্রিল, ১৯৯৫

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : সংবাদকর্মী (ক্রাইম রিপোর্টার, আজকের গোয়েন্দা সংবাদ; স্টাফ রিপোর্টার,
শাহাদাতের স্থান : রক্তাক্ত আইডি কার্ডসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত হিসেবে নিবন্ধিত

শহীদের জীবনী

মো: আব্দুন নুর, এক নাম, এক জীবন, এক অসমাপ্ত গল্প।১ এপ্রিল, ১৯৯৫ স্বপ্নে ভরা চোখে বিশ্ব দেখার তাড়নায় মিশে গিয়েছিল এক সম্ভাবনার সূচনা।বাবা মো: আবুল বাসার, মা মোসাম্মৎ আসমা খাতুন।দু'জনেই জীবিত, কিন্তু বেঁচে আছেন এক ছায়াচাপা শোকের নীচে, যেন প্রতিটি শ্বাসে মনের ভেতর রক্তের টানকার শব্দ শোনা যায়।নুর পেশায় সংবাদকর্মী ছিলেন।সত্যের অনুসন্ধানী, মানুষের জন্য তথ্যের পথিক।দুই সংবাদপত্রে তাঁর কলমের ছাপ, তাঁর চিন্তার তরঙ্গ অজস্র পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল শক্তি, জানাশোনা, যত্নের শব্দ।কিন্তু জুলাইয়ের বিদ্রোহ এসে বদলে দিলো সব।যখন রাস্তায় নেমে পড়ল শত শত বুক স্বাধীনতার তৃষ্ণায়, তখন নুর নেমে পড়লেন মাইক্রোফোন হাতে, আইডি কার্ড ঘাড়ে ঝোলাতে ঝোলাতে।তাঁর পরিচয়পত্রটি ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার শিলালিপি, সেটি আজ রক্তের সাক্ষী।যুদ্ধ কীভাবে সঙ্গীত হয়ে ওঠে? প্রশ্নটা যেন কান্নায় মিশে গিয়েছিল সেদিন, যখন নুরের মাইকে ধরা পড়ল গুলির আওয়াজ, আর তাঁর আর্তনাদ হয়ে উঠল প্রতিবাদের নতুন স্লোগান।সেই ছোট্ট ক্যামেরা ফ্ল্যাশ, ঐ ডাস্টকোটের পকেটে থাকা পেন্সিল, সব বদলে গিয়েছিল রক্তের ছাঁচে। পরিবারের ভাষ্যে, "রক্তের দাগ এখনো যায়নি, অনেকবার ধোয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু রক্ত তো কেবল তরল নয়, তা তো ইতিহাস।" এই দাগ শুধু জামার নয় এগুলি এক মায়ের বুকের ভেতর চিরস্থায়ী ছবি হয়ে ওঠেছে।

নুরের ঘর আজ শূন্য তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তার স্নিগ্ধ হাসি আর নেই, শুধুই স্মৃতির অবয়ব ভাসে দেয়ালে।স্ত্রী আগেই আলাদা হয়ে গেছেন।মেয়ে, হয়তো দিনের পর দিন মাদ্রাসার বোঝা সামলাচ্ছে, তার বুঝে ওঠা থেকে অনেক আগে হারিয়েছে বাবার সুর, বাবার সুরক্ষা।

এই শহীদ আর আজকের পৃথিবী।তারা যেন খালি চোখে দেখা যায় না, তবুও অনুভূত হয় প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, প্রতিটি স্মৃতির কোণে।আহা, যদি কেউ একবার উচ্চারণ করে, "নুর এখানে ছিলেন, সত্য বলছিলেন," হয়তো সেই শব্দই মাকে ফেরত দেবে একটুখানি শান্তি।কিন্তু সত্য হলো, নুর নেই কিন্তু তার কণ্ঠ, তার স্পন্দন, তার সাহস আর নেইনি; তা বয়ে যায় খবরের পাতায়, মানুষজনের মনে, আর তীক্ষ্ণ এক শূন্যতায়, যা রক্তের মতো যা যায় না কখনো।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট – লাল জুলাইয়ের ইতিহাস

২০২৪ সালের জুলাই, বাংলার রাজপথে ইতিহাস গড়ে উঠছিল, কিন্তু সে ইতিহাস রক্ত দিয়ে লেখা, কান্না দিয়ে ধুয়ে ফেলা।শহরের আকাশ যেন প্রতিদিন আরও লাল হয়ে উঠছিল।সূর্যাস্ত নয়, বরং আগুনের ধোঁয়া, গ্রেনেডের ঝাঁজ আর মানুষের আর্তনাদের ছায়া তাকে রাঙাচ্ছিল।কোটা সংস্কার আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল ১ জুলাই এক ন্যায্য দাবি নিয়ে, তা ১৫ জুলাইয়ের পরই রূপ নেয় এক ভয়াবহ দমন-পীড়নের নাটকে।আর এ নাটকের মঞ্চে নামল ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, আর পুলিশের রক্তচক্ষু।যে চোখে ছিল রাষ্ট্রের শাসনের ভাষা, তাতে নেমে এল একটাই নির্দেশ- ভয় দেখাও, থামাও, নত করো।

কিন্তু প্রতিরোধ তো পাথরের মতো জমে উঠেছিল বহুদিন ধরে।তাই, রামপুরা থেকে মিরপুর, বনশ্রী থেকে তেজগাঁও সব জায়গা একটাই মুখোশ পড়ে ফুঁসে উঠল: প্রতিবাদের।ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল খালি হাতে, বুক চিতিয়ে, যেন তারাই ছিল বুলেটপ্রুফ মানবপ্রাচীর।যারা গণতন্ত্রের পাঠ পড়ছিল বইয়ে, তারাই রাস্তায় শেখাতে লাগল কিভাবে সাহস শব্দের প্রতিরূপ হয়।সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নেমে এল রাস্তার পাশে, কেউ খাবার দিল, কেউ পানি, আর কেউ স্রেফ চিৎকারে সঙ্গ দিল প্রতিবাদী ছাত্রদের।এ এক এমন সময়, যখন ভয় আর চুপ করে থাকার যুগ শেষ হচ্ছিল; শুরু হচ্ছিল লাল জুলাই নামক এক ব্যর্থ নয়, বরং বীরত্বময় বিপ্লবের সময়চিত্র।

আর ঠিক এই সময়েই উঠে এলেন আব্দুল নুর।একজন সংবাদকর্মী নন শুধু, এক জীবন্ত দলিল, এক ক্ষুদ্র কলম যিনি হয়ে উঠলেন সময়ের আয়না।তাঁর হাতে ছিল না অস্ত্র, ছিল একখানা নোটবই, একটা মাইক্রোফোন, আর গলায় ঝোলানো এক সাংবাদিকের পরিচয়পত্র, যেটা হয়ে উঠল রক্তের দলিল।তিনি শুধু ভিডিও করছিলেন না; তিনি গল্প জড়ো করছিলেন, বঞ্চিতদের কণ্ঠ তুলে ধরছিলেন, আর রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন সত্যকে কবর দেওয়া যায় না।

আব্দুল নুর জানতেন, যে রাষ্ট্র সত্যের ভয় পায়, সে রাষ্ট্র সবচেয়ে হিংস্র।তিনি জানতেন, সাংবাদিকতা এক যুদ্ধ, যেখানে কলমই বন্দুক।তাই তিনি থামেননি। গুলি এসেছিল তাঁর দিকেও হয়তো তাঁকে থামাতে, হয়তো তাঁকে ভয় দেখাতে।কিন্তু তাঁর ক্যামেরা ছিল চালু, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ়।যখন তিনি পড়ে গেলেন, তাঁর রক্ত ভিজিয়ে দিলো সেই রাস্তাটিকে, যেখান দিয়ে হাজারো প্রতিবাদী পা ফেলেছিল।

সে রক্ত মুছে ফেলা যায়নি, কারণ তা কেবল দেহ থেকে আসা রক্ত নয় তা ছিল সাহসের, চেতনার, এক নতুন স্বাধীনতার রক্ত, যা স্মার্টফোনের স্ক্রিন পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে।মানুষ দেখেছিল সাংবাদিকদেরও গুলি করা হয়, সত্য বললেও মারা যেতে হয়।আর মানুষ ভুলেনি।

আজ লাল জুলাই শুধু আন্দোলনের দিন নয় এটা এক চেতনার নাম।সেটা কখনো অনলাইনের ট্রেন্ডিং নয়, সেটা হৃৎপিণ্ডে জেগে থাকা আগুন।আব্দুল নুর সেই আগুনে পুড়েছিলেন, জ্বলে উঠেছিলেন।আর সে আলোর তাপ আজো যারা বেঁচে আছে, তাদের বুকে জ্বলে, ছাই হয়ে যায় না।

লাল জুলাইয়ের ইতিহাস একদিন কেউ লিখবে ঠিকই কিন্তু শহীদেরা জানেন, তাঁদের রক্তই ছিল প্রথম খসড়া।

যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট, ২০২৪ এক বিভীষিকাময় বিকেল।আব্দুল নুর সেইদিনও বেরিয়েছিলেন খবর সংগ্রহ করতে।তার চোখে ছিল ক্লান্তি, কিন্তু লক্ষ্য অটুট সত্য খোঁজা, তা তুলে ধরা।অথচ রাজধানীর রাজপথ তখন আর কোনো খবরের ক্ষেত্র নয়; সে এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে শব্দ মানে শুধু স্লোগান নয়, গুলির আওয়াজও।পলকে পলকে পাল্টে যাচ্ছিল দৃশ্যপট।কোথাও কাঁদানে গ্যাস, কোথাও রক্ত, কোথাও মানুষের আর্তনাদ।সেদিনও তিনি কাঁধে ব্যাগ আর হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে

ছুটছিলেন সত্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে, ইতিহাসের মুখে আঙুল রাখতে।

ঠিক বিকেল চারটা।মো: আবুল বাসার, নুরের বাবা, একটি ফোন পান।অচেনা নম্বর, অচেনা কণ্ঠ।কণ্ঠ বলে, "আব্দুল নুর নামে কাউকে চিনেন?" একটা মুহূর্ত যেন ঘন হয়ে আসে, সময় যেন জমে ওঠে বুকের ভেতরে।তিনি জবাব দেন, "আমার ছেলে।' ওপাশ থেকে বলা হয়, "তাড়াতাড়ি মেডিকেলে আসেন।' কিন্তু এ ডাক শুধু হাসপাতালে যাওয়ার নয়।এ ডাকে ছিল এক শেষ বিদায়ের নিরব আকুতি।এটা এক লাশের নিমন্ত্রণ।এক পিতা যেন তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে হাঁটতে থাকেন, হৃদয়ের প্রতিটি কোণে আতঙ্কের ঢেউ।

রিকশায় ওঠেন বাবা, সঙ্গে ছোট ছেলে।পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ, গেট বন্ধ, রাস্তা জটিল।তাঁরা ঘুরে ঘুরে বাউনিয়া বাজার,
ফ্লাইওভার, ইসিবি মোড় হয়ে সেনানিবাস পর্যন্ত হেঁটে যান।পায়ের নিচে ক্লান্তি, চোখে ঘুমহীন আশঙ্কা।হঠাৎ এক অজানা মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের থামান।না কোনো সংবাদকর্মী, না আত্মীয় তবুও মানুষ।সেই সহৃদয় মানুষ তাঁদের তুলে নেন, পৌঁছে দেন মুগদা মেডিকেলের ইমারজেন্সিতে।

সেখানে খোঁজেন 'রাকিব' নামের ছেলেটিকে যিনি ফোন করেছিলেন।রাকিব বলেন, "আমি যতক্ষণ লাশ হস্তান্তর না করি, ততক্ষণ আপনাদের পাশেই থাকব।' একটা ভরসার কণ্ঠ, অথচ গলায় নেমে আসা বিষন্নতা স্পষ্ট ছিল।এরপর তাঁরা যান মর্গে।সেখানে খুলে দেওয়া হয় এক পর্দা, একটি মৃতদেহ, মাথার পেছনের অংশ উড়ে গেছে গুলিতে।মেঝেতে লেগে থাকা গলিত রক্তে তা চেনা যায় না প্রথমে।তাঁর পাঞ্জাবি তখন রক্তমাখা, কারণ মেডিকেলের ফ্লোরে এত রক্ত ছিল, যে জুতোয় নয়, হৃদয়ে রক্ত লাগে।

এই তো, এক সত্যসন্ধানী সাংবাদিক যার কলম প্রশ্ন করত, যার কণ্ঠ ছিল সাহসের প্রতিধ্বনি–সে পড়ে আছে মাটিতে, জড় পদার্থের মতো।তার ব্যাগ পড়ে আছে পাশে, ভেতরে হয়ত অর্ধলিখিত কিছু নোট, হয়ত কিছু ছবি।সে এখন আর প্রশ্ন করবে না, প্রতিবেদন বানাবে না, সে নিজেই হয়ে গেছে প্রতিবেদন, একটি রক্তাক্ত শিরোনাম।

রাত ৯টায় লাশ নেয়া হয় গ্রামের বাড়ির পথে।কোনো লাল কার্পেট ছিল না, কোনো রাষ্ট্রীয় সালাম নয়।তার মৃত্যু লাইভে ছিল না–ফেসবুকের স্ক্রিনে কেউ চিৎকার করেনি, ইউটিউব ভিডিওতে কেউ চোখ ভেজায়নি।এই মৃত্যু একান্তই নিঃশব্দ, একমাত্র পিতার চোখে ঠাঁই পাওয়া এক অশ্রুপাতের প্রতিবেদন।যেন রাষ্ট্র নিজেই খুন করল এক সাংবাদিককে, যেন প্রতিটি গুলি বলছিল "সত্য বললে মরতে হবে।'

এই মৃত্যু আমাদের সবার লজ্জা, আমাদের নিস্তব্ধতাই তার আসল খুনী।আজ আব্দুল নুর নেই, কিন্তু তার রক্ত লেগে আছে আমাদের চোখের পাতায় প্রতিবার চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখি, এক সাংবাদিক মাটিতে পড়ে আছেন, পাশে পড়ে আছে তার কলম, যা এখনো কিছু বলতে চায়... তবে কেউ শোনে না।

পরিবার ও বেদনার বিবরণ

আব্দুল নুরের বাবা, মো: আবুল বাসার, এখনো রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেন।ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকে ঠিক বিকেল চারটায়–যে সময় সেই ফোনটা এসেছিল। এক অচেনা কণ্ঠস্বর, এক অচেনা যন্ত্রণার প্রহর।তাঁর হৃদয়ে সেই মুহূর্ত এখনো রক্তাক্ত ঘা হয়ে বাজে।মাথার ভেতর ফিরে ফিরে আসে সেই প্রশ্ন: "আব্দুল নুর নামে কাউকে চিনেন?"–জীবনের এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর দিতে গিয়ে একটা জীবন শেষ হয়ে গেল।

আর মা–আসমা খাতুন–তাঁর শোক অন্যরকম।তিনি কিছু বলেন না, কারও চোখে তাকান না, শুধু চুপচাপ মাথা নিচু করে থাকেন।দিনের পর দিন, রাতে রাতে, শাড়ির আঁচলে মুছে ফেলেন সেই অশ্রু, যা শব্দহীন হয়ে ঝরে পড়ে।একদিন তিনি স্বপ্ন দেখতেন–ছেলের হাত ধরে ওমরাহ করবেন, কিংবা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পরিবারের জন্য একটা ছোট বাড়ি কিনবেন।আজ সেই বাড়ির স্বপ্ন ভেঙে ছড়িয়ে আছে একটা মৃত শরীরের পাশে, এক কোলাহলহীন ঘরে।

আব্দুল নুরের স্ত্রী আগেই সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, রেখে গিয়েছিলেন একটি মেয়ে বয়স কম, এখনো মাদ্রাসায় পড়ে।সে কি বুঝবে রাষ্ট্র কীভাবে তার বাবার মাথা উড়িয়ে দিয়েছে? সে কি জানবে, বাবা নামের মানুষটি কেবল গুলি খেয়েই মারা যাননি, বরং তাঁর ওপরে জেগে আছে নীরব সমাজের তীব্র অবহেলা, কাঁধে চাপানো এক বুক নিরুত্তর প্রশ্ন?

এই পরিবার খুব সাধারণভাবে চলত।না কোনো বিত্তের দম্ভ, না কোনো আরামের অভ্যাস।দুই বেলা খাওয়া, কিছু সঞ্চয়, আর একরাশ স্বপ্নই ছিল তাঁদের সম্পদ।এখন সেই সংসারে নেই উপার্জনক্ষম কেউ।আছে শুধু এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা, যা প্রতিদিন ঘরের বাতাসে হাহাকার হয়ে বাজে।

তবু তাঁরা কারো কাছে হাত পাতেন না।আবুল বাসার আজো সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের দেখলে বলেন, "আমার ছেলেও এসব করত।' কিন্তু কণ্ঠের ভেতর সেদিনের গুলি ঢুকে গেছে, কথা যেন আর বের হয় না।তাঁরা চায় না দান, চায় না সহানুভূতির অভিনয়; তাঁরা চায় ন্যায্য স্বীকৃতি।চায় রাষ্ট্র মুখ খুলুক, চায় গণমাধ্যম অন্তত একটিবার বলুক আব্দুল নুর শহীদ হয়েছেন সত্য বলার অপরাধে।

কিন্তু চারদিক থমথমে।মিডিয়া মুখ ঘুরিয়েছে, মন্ত্রীদের ঠোঁট সেলাই, প্রতিবাদীরা বাঁচতে ব্যস্ত।আব্দুল নুরের লাশ শুধু ফেসবুক স্ট্যাটাস হয়ে পড়ে আছে কেউ সেভ করে রাখেনি, কেউ আর পড়ে না।অথচ তাঁর মৃত্যু নিঃশব্দ নয়।তাঁর চিৎকার আজো বাতাসে কাঁপে, তাঁর শেষ চোখের চাহনি যেন মেঘের ভেতর জ্বলে ওঠা বিদ্যুতের মতো গর্জন করে বলে,

"আমি গুলি খেয়েছি, কিন্তু এখনো প্রশ্ন করে যাই তোমরা কোথায়?"

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।আছে শুধু একটা নিঃসঙ্গ পরিবার, একটা রক্তাক্ত স্মৃতি, আর এক যুদ্ধ–যা নীরবতাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে।

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকার

একজন শহীদের কন্যা যেন অনাথ হয়ে না যায় এই দাবিটাই হোক আমাদের জাতিগত বিবেকের প্রথম পরীক্ষা।রাষ্ট্রের সংবিধান যতই পাতায় লেখা থাকুক, ন্যায় যদি রক্তাক্ত রাস্তার ধুলায় পড়ে থাকে, তবে আমাদের সমস্ত নীতি কেবল শব্দের নকশা হয়ে দাঁড়ায়।আব্দুল নুর শহীদ হয়েছেন এই কথাটির অর্থ কেবল নয় যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন; অর্থ এই যে তাঁর জীবনের প্রতিটি শ্বাস ছিল এক নীরব প্রতিবাদ, প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল এক প্রতিজ্ঞা সত্য বলার, অন্যায়ের কাছে না ঝুঁকার।তাঁর মৃত্যুর দায় শুধু তাঁর পরিবারের নয়, এই সমাজের, এই রাষ্ট্রের, এই সময়ের।

তাঁর কন্যার ভবিষ্যৎ যেন নিরাপত্তাহীন অন্ধকারে ডুবে না যায়, এটাই হোক জাতির প্রথম প্রস্তাব।সরকারি শিক্ষাবৃত্তি তাঁর প্রাপ্য, কারণ তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক তাঁর পিতা নিজেই জীবনের সর্বোচ্চ পাঠ দিয়েছেন নিজের প্রাণ দিয়ে।নিয়মিত আর্থিক সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, ও তার মাদ্রাসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নেওয়া রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব হয়ে উঠতে হবে।কোনো করুণা নয় এটি একটি শহীদের প্রতি ন্যায্যতা।

আমরা চাই, সরকার একটি ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি দিয়ে পরিবারটিকে স্বনির্ভর করুক যাতে তারা হাত পাততে না হয়, মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।চাই, মেয়েটি উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যেতে পারুক সে বড় হয়ে যেন বলতে পারে, "আমার বাবা শহীদ ছিলেন, আর আমি তার উত্তরাধিকার।'

আজকের প্রজন্ম যেন জানে আব্দুল নুরও এই মাটির সন্তান ছিলেন।তিনি কোনো বীরের পোশাক পরেননি, কেবল হাতে ছিল একটি কলম, আর চোখে ছিল কিছু প্রশ্ন।সেই কলমটিকে গুলি থামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার স্বপ্নকে থামাতে পারেনি।তাঁর রক্ত শুধু রাজপথে নয়, আমাদের বিবেকেও লেগে আছে।তাঁর মৃত্যু যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একটি গুলি কেবল একটি প্রাণ থামায় না, সেটি ইতিহাসের কলম ভেঙে ফেলে, ভবিষ্যতের গল্প থামিয়ে দেয়।

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

তাই আজ প্রশ্ন নয়, উত্তর চাই আমরা কীভাবে এই মৃত্যুকে মূল্য দেব? কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব সেই চেতনা, যা একদিন রাজপথে নীরবে রক্ত হয়ে ঝরেছিল?

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: আব্দুন নুর

পেশা : সংবাদকর্মী (ক্রাইম রিপোর্টার, আজকের গোয়েন্দা সংবাদ; স্টাফ রিপোর্টার,
অভিযান নিউজ টিভি)

জন্ম : ০১ এপ্রিল ১৯৯৫

পিতা : মো: আবুল বাসার

মাতা : মোছা: আছমা খাতুন

স্ত্রী : বিচ্ছিন্ন

সন্তান : ১ কন্যা (মাদ্রাসা শিক্ষার্থী)

মৃত্যুর স্থান : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদ হওয়ার তারিখ : ০৫ আগস্ট ২০২৪

আঘাত : মাথায় গুলি

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা : রক্তাক্ত আইডি কার্ডসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত হিসেবে নিবন্ধিত

দাফন : নিজ গ্রামের বাড়ি, বাগেরগাঁও, উষ্থি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

রক্তের গ্রুপ : +

জন্মস্থান : ময়মনসিংহ

বর্তমান ঠিকানা : বাসা/হোল্ডিং: ৪৩, সেক্টর: ১০, উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ডাকঘর: ২২৩৩

স্থায়ী ঠিকানা : বাগেরগাঁও, উষ্থি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

মেডিকেল কেস আইডি : ২৪৯৯২